শুক্রবার, ১৫ আষাঢ়, ১৪২৪
বর্ষ : ১২, সংখ্যা : ১৯২

চিনের সেনারা সীমান্তে উত্তেজনা সৃষ্টি করছে, বেজিং সতর্ক হোক

১৯৬২ সাল থেকে চিনারা ভারতের সীমান্তে অহেতুক উত্তেজনার সৃষ্টি করছে। এর পাল্টা কড়া জবাব দেওয়া দরকার। এবার চিনের দাবি, ভারতীয় জওয়ানরা সিকিমের আন্তর্জাতিক সীমান্ত পেরিয়েছে। এটি সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগ বেজিংয়ের, আসলে নানা ছলনায় চিনের সেনারা সব নিয়ম ভঙ্গ করে আন্তর্জাতিক সীমান্ত রেখা পার হয়ে সিকিমে ঢুকে পড়েছিল, কিন্তু শেষে মানব প্রাচীর তৈরি করে ভারতীয় জওয়ানরা চিনের সেনাদের ফেরত পাঠায়।

চিনের এই বেয়াদপি সর্বত্র, তারা চিন সাগরের দখলদারি নিতে নানা কাণ্ড ঘটাচ্ছে। আবার ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্বের কথা বলে সন্ত্রাসবাদের প্রশ্নে পাকিস্তানের পিঠ চাপড়াচ্ছে। পাঁচের দশকে এদেশের কিছু লোক চিনের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনে আগ্রহী ছিল। তখন পরিস্থিতি ভিন্ন ছিল। কিন্তু, ৬২ সালে ভারতীয় সীমান্তে চিনের হামলার পর ওই দেশের আগ্রাসী নীতি প্রকট হয়ে পড়ে। মানুষ উপলব্ধি করছে, চিনে চলে দলতন্ত্র।

এই প্রেক্ষাপটে সিকিমের নাথুলা পাস দিয়ে ভারতের তীর্থযাত্রী ও পর্যটকদের কৈলাস মানস সরোবর যাত্রায় বাধা দিচ্ছে চিনা সেনারা। এখন কেন ভারতীয় তীর্থযাত্রীদের যেতে দেওয়া হল না। তা নিয়ে অদ্ভুত যুক্তি দেখাচ্ছে চিন। ওই দেশের মুখপাত্র লু-কং বলেছেন, নিরাপত্তার কারণেই ভারতীয় তীর্থযাত্রীদের ঢুকতে দেওয়া হয়নি। চিনের এই অযৌক্তিক কথা বার্তা অবশ্য উড়িয়ে দিয়েছে ভারত। তবে বিষয়টির সুষ্ঠু নিস্পত্তিতে দু'দেশের বিদেশ সচিব পর্যায়ের আলোচনা হওয়া একান্ত জরুরি। এই সমস্যার আলোচনা হওয়া একান্ত জরুরি। এই সমস্যার সমাধান না হলে ভুলবার্তা যাবে মানুষের মধ্যে। এটা কখনই কাঙ্ক্ষিত নয়। প্রসঙ্গত বলা দরকার যে ২০১৫ সালে নয়াদিল্লি ও বেইজিংয়ের মধ্যে আলোচনার ভিত্তিতে কৈলাস যাত্রার ওই রাস্তাটি খুলে দেওয়া হয়। এখন এ ব্যাপারে চিন বেঁকে বসায় সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে।

অমৃতবার্তা

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

চায়। তাই ত ওদের এক থাকের লোককে বলে কর্তাভজা, অর্থাৎ যারা কর্তাকে—গুরুকে—ঈশ্বর বোধে ভজনা করে পুজা করে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ ও সর্বধর্মসমন্বয়
Why all scripures---all Religions----are true.

শ্রীরামকৃষ্ণ—দেখছো কত রকম মত।, পথ। অনন্ত মত অনন্ত পথ!

ভাবনাথ—এখন উপায়!

শ্রীরামকৃষ্ণ—একটা জোর করে ধরতে হয়। ছাদে গেলে পাকা সিঁড়িতি উঠা যায়, একখানা মইয়ে উঠা যায়, দড়ির সিঁড়ির উঠা যায়; এক গাছা দড়ি দিয়ে, এক গাছা বাঁশ দিয়ে, উঠা যায়। কিন্তু, এতে খানিকটা পা, ওতে খানিকটা পা দিলে হয় না।। একটা দৃঢ় করে ধরতে হয়। ঈশ্বর লাভ করতে হলে, একটা পথ জোর করে ধরে যেতে হয়।

"আর সব মতকে এক একটি হলে, একটা পথ জোর করে ধরে যেতে, হয়।

['আমি কোন পথের?' কেশব, শশধর ও বিজয়ের মত **]**

"আচ্ছা, আমি কোন পথের? কেশব সেন বলতো, আপনি আমাদেরই মতের,—নিরাকারে আসছেন। শশধর বলে, ইনি আমাদের। বিজয়ও (গোস্বামী) বলে, ইনি আমাদের মতো লোক।"

ঠাকুর কি বলিতেছেন যে, আমি সব পথ দিয়াই ভগবানের নিকট পৌঁছিয়াছি—তাই সব পথের খবর জানি? আর সকল ধর্মের লোক আমার কাছে এসে শান্তি পারে? ঠাকুর পঞ্চবটীর দিকে মাষ্টার প্রভৃতি দু-একটি ভক্তের সঙ্গে যাইতেছেন—মুখ ধুইবেন। বেলা বারটা, এইবার বান আসিবে। তাই শুনিয়া ঠাকুর পঞ্চবটীর পথে একটু অপেক্ষা করিয়েছেন। ***(ক্রমশ)***

দিনপঞ্জিকা

১৫ আষাঢ়, ভাঃ ৯ আষাঢ়। **৩০ জুন,** ১৫ আহার, সংবৎ ৭ আষাঢ় সুদি, ৫ শাওয়াল। সূর্য্যোদয় ঘ ৪।৫৮, সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।৫৮। **শুক্রবার,** সপ্তমী রাত্রি ঘ ১০।১ মিঃ। উত্তরফাল্গুনীনক্ষত্র রাত্রি ১০।১ গতে বিষ্টিকরণ।

জন্মে—সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী রবির দশা। দিবা ঘ ৬।২০ গতে কন্যারাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ রাত্রি ঘ ১২।৩৮ গতে দেবগণ অষ্টোত্তরী বুধের বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা। **মৃতে**—ত্রিপাদদোষ রাত্রি ঘ।১০।১ গতে দ্বিপাদদোষ রাত্রি, ঘ ১২।৩৮ দোষ নাই। **বারবেলাদি** ঘ ৮।২০ গতে ১১।৪১ মধ্যে। **কালরাত্রি** ঘ ৯।২ গতে ১০।২২ মধ্যে। **যাত্রা**— শুভ উত্তরে ও পশ্চিমে নিষেধ, সন্ধ্যা ঘ ৬।২৫ গতে বায়ুকোণে নৈর্ঋতেও নিষেধ, রাত্রি ঘ ১০।১ গতে যাত্রা নেই। **শুভকর্ম্ম**--- দিবা ঘ ১১।৪১ গতে গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন পঞ্চামৃত সাধভক্ষন নামকরণ। নিষ্ক্রমণ। পুংবত্নধারণ জলাশয়রা দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য বিক্রয়বাণিজ্য বিপণ্যারম্ভ। পূণ্যাহ গ্রহপুজা শান্তিস্বস্ত্যয়ন। হলপ্রবাহ বীজবপন বৃক্ষাদিরোপন ধ্যান্যারোপন ধ্যানাচ্ছেদন ধ্যানস্থাপন কারাখানারম্ভ গৌবিক্রিয়াদি।

বিবাহ---সন্ধ্যা ঘ ৬।২ গতে রাত্রি ঘ ৯।২ মধ্যে ধনু ও মকরলগ্নে সুতহিবুকযোগে বিবাহ। **বিবিধ**—সপ্তমীর চতুর্দ্দশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন।

মুসলিম পঞ্জিকা

১৫আষাঢ়, ভাঃ ৯ আষাঢ়। **৩০ জুন,** ১৫ আহার, ৫ শাওয়াল। উঃ ৪।৫৮, অঃ ৪।৫৮, অঃ ৬।২৪ শুক্রবার, সপ্তমী রাঃ ঘঃ ১০।১।

মাদককে 'না' বলুন।

যে নেশা করতে বলে, সে বন্ধু নয়

লিপি

মাদক বিরোধী আন্দোলন

দার্জিলিং: রাজনৈতিক সুবিধাবাদী মানসিকতা সীমাহীন দিগন্তের দিকে ধাবমান

মমতা এবং গুরুং-এর অভিধানে 'নম্রতা' শব্দটির স্থান নেই

আশিস বিশ্বাস

দার্জিলিং এবং উত্তরবঙ্গের পাহাড়ি জেলাগুলিতে যে বিরূপ পরিস্থিতি চলছে, তার জন্য দায়ী তৃণমূল কংগ্রেস এবং গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার ধারাবাহিক রাজনৈতিক সুবিধাবাদের পৃষ্ঠপোষকতা।

দু'টি দলই চালান দুই আলাদা ব্যক্তিত্ব। একে অপরের প্রতি তীব্র অপছন্দ থাকলেও তাঁদের মিল অনেক। যা তাঁরা মানতে চাইবেন না। কিন্তু, মনে রাখতে হবে, ২০১২-১৩ সাল পর্যন্ত তাঁরা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন। বিমল গুরুং প্রকাশ্য সভায় মমতাকে 'আমাদের মা' বলে সম্বোধন করেছিলেন। আবেগে ভাসমান রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীও বলেছিলেন, বাঙালি ও গোর্খারা ভাইভাই। এও বলেছিলেন।, দেখ, আমার পাহাড় হাসছে। পাহাড়ের নতুন মা দাবি করেছিলেন, পাহাড়ের সমস্যা তিনি ১৭ দিনেই সমাধান করে দিয়েছেন। সেদিন ছিল পরস্পর পিঠচাপড়ানির সময়। কিন্তু, গুরুং আগেই বলে রেখেছিলেন, বাংলাকে ভাগ করার ক্ষমতা তাঁর আছে। সেই থেকে চলছে। রাজনৈতিক রোলার কস্টার তথা দোলাচলের খেলা।

পাঠকদের খেয়াল করিয়ে দেওয়া দরকার যে, এই দুই ব্যক্তিত্বের মধ্যে সবচেয়ে বড় মিল হল, রাজনৈতিক বার্তা দেওয়ার সময় 'নম্রতা' শব্দটির ব্যবহার এঁরা করেন না। এক রাজনৈতিক ভাষ্যকারের মতে অবশ্য, ইদানীংকালে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই শব্দের কোনও মূল্য নেই।

অস্বীকার করা যাবে না, পশ্চিবঙ্গ সরকার জিটিএ'র কাজকর্ম চলার ব্যাপারে সহজ পথ করে দেয়নি। উল্টোদিকে জিটিএ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে রাজ্য সরকারের অভিযোগ, বিগত পাঁচ বছরে তারা পাহাড়ে ৯০০ কোটি টাকা পাঠিয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের দিক থেকেও এসেছে ৬০০ কোটি টাকা। কেউ এতদিন এই প্রসঙ্গে কোনও প্রশ্ন তোলেনি। যে কারণে টিএমসি সংসদ সদস্য ডেরেক বলেছেন, এত টাকা কোথায় গেল? এই টাকার যে উন্নয়ন হতে পারত, তার চিহ্ন কোথায়? জিটিএ গঠনের সময় গোর্খা নেতারা যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা কোথায় গেল? কোথায় গোর্খাদের জন্য কাজের সুযোগ তৈরি হল? নতুন সম্পদ তৈরি হয়েছে কি? যখন জাহাজ ডুবছে, তখন কেন জিজেএম নেতারা ভয়ার্ত ইঁদুরের মতো পালাতে ব্যস্ত? কারণ এই যে, জিটিএ'র খরচ-খরচা সম্পর্কে রাজ্য সরকার অডিট করাতে চেয়েছে?

জিটিএ'র ক্ষমতাকে টিএমসি গুরুত্ব বা পাত্তা দেয়নি। বিগত পাঁচ বছরের রাজ্যে সরকার পাহাড়ে কম করে ১৬টি স্বশাসিত বোর্ড গঠন করেছে। প্রত্যেকের জন্য অর্থ বরাদ্দ করেছে। সেইসূত্রে ভুটিয়া, লেপচা, তাওয়াং এবং লিম্বাদের মতো ছোট জনজাতিগুলি খুশি হয়েছে। কিন্তু, সেখান থেকে শুরু হয়েছে অন্য কাহিনি। কারণ, দার্জিলিং ও তার আশপাশে গোর্খারাই ঘাঁটি গেড়েছে। যারা এখন পাহাড়ের বিপুল অংশ নিজেদের তাঁবেদারে আনতে চাইছে। অথচ এরা আদতে ভুটান সহ উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্য থেকে উৎখাত হওয়া জনজাতি। যাদের বিরুদ্ধে আগে থেকে আইনশৃঙ্খলা ভাঙার অভিযোগ রয়েছে। তাছাড়া এদের অনেকেরই উপযুক্ত নাগরিত্বের প্রমাণ নেই।

স্রেফ ভোটের তাগিদে কংগ্রেস, সিপিএম এবং পরে টিএমসি এই উৎখাত হওয়া জনজাতিকে এখানে ঘাঁটি গাড়তে দিয়েছে। অথচ, এই এলাকা নেপাল সীমান্তের কাছে হওয়ায় অত্যন্ত স্পর্শকাতর। পাহাড়ের অন্য জনজাতিরা গোর্খাদের দেশভক্তি সম্পর্কেও আড়ালে গুরুতর প্রশ্ন তুলছেন। বলছেন, জালিয়ানওয়ালাবাগে জনতার উপর গুলি চালিয়েছিল গোর্খারা।

গাড়ওয়াল এলাকায়. গোর্খারা একসময় বিপুল অত্যাচার চালিয়েছে। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের সময় গোর্খাদের আনুগত্য ছিল বৃটিশদের প্রতি। বস্তুত, গোর্খাদের হাতে নিগৃহীত হওয়ার ভয় থেকেই পাহাড়ের ছোট জনজাতিগুলি টিএমসি'র স্বায়ত্তশাসন প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়েছিল। যাতে নিজেদের অস্তিত্ব টিকে থাকে।

কিন্তু, জিটিএ সম্পর্কে যে নজরদারি দরকার ছিল, তা কলকাতা কেন্দ্রিক শাসক করেনি। বরং জিটিএ নেতাদের উস্কানি দেওয়া হয়েছে। জিটিএ এলাকার চরিত্র বদল করা হলেও তা তাদের জানানো হয়নি। ফলে জিজেএম অস্তিত্ব সংকটের আশঙ্কা করছিল। বিভিন্ন স্তরের নেতারা প্রকৃত ক্ষমতার দাবি করছিলেন। যদিও তা সর্বাংশে সত্য নয়।

পুলিশ এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয় বাদ দিলে জিটিএ বিপুল ক্ষমতা ভোগ করছিল।

ছোট স্বশাসিত বোর্ড গঠন করে টিএমসি আসলে ছোট জনজাতির উপকার করতে চাইছিল কি না, তা নিয়ে বিতর্ক হতে পারে। কিন্তু, অন্যদিকে জিজেএম নেতারা কিন্তু সিকিম ও নেপাল থেকে নানাভাবে সাহায্য পাচ্ছিলেন। এরা ঘনঘন নেপাল যেতেন। উল্লেখনীয় বিষয় হল, হঠাৎ করে সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী পবন চামলিং গোর্খাল্যান্ডের দাবিকে সমর্থন জানিয়েছেন।

যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তার জন্য সমতলের শাসক বিরোধী সব দল টিএমসিকে দায়ী করছে। কিন্তু, সাম্প্রতিক পুরভোটে টিএমসি পাহাড়ে প্রায় ৩৫ শতাংশ ভোট পেয়েছে। মিরিকে জিতেছে। জিজেম নেতারা তাই অশনি সঙ্কেত দেখেছেন। বিশেষত সামনের জিটিএ ভোটকে কেন্দ্র করে। তাই স্থানীয় দুর্নীতি ও অপশাসন ধামাচাপা দিতেই কি ফের গোর্খাল্যান্ড আন্দোলন জাগিয়ে তোলা হয়? আসলে সুবিধাবাদই বর্তমান রাজনীতির আসল কথা। ফলে পাহাড়ের মানুষের দীর্ঘমেয়াদি ভিত্তিতে লাভ হবে কি না, সেটা আপাতত গৌণ।

(মতামত লেখকের নিজস্ব)

মানব সভ্যতা ও সামগ্রিক বাস্তুতন্ত্রের উপর জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ দূষণের প্রভাব

ড. জে এস পাণ্ডে

বাস্তুতন্ত্র ও জনস্বাস্থ্যের ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব

বায়ু, জল ও মৃত্তিকা দূষণের সঙ্গে সঙ্গে জলবায়ু পরিবর্তনও বাস্তুতন্ত্র ও জনস্বাস্থ্যের ওপর মস্ত বড় বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঘন ঘন তাপপ্রবাহ, বন্যা, খরার মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয়গুলির জন্য মূলত জলবায়ু পরিবর্তনই দায়ী। এই ধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয়গুলি আবার নানা রোগব্যাধি ডেকে আনছে এবং সেই সঙ্গে বিশেষ কিছু প্রজাতির জীবাণুবাহিত রোগের শিকার হয়ে মৃত্যুর ঘটনা বাড়ছে। ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু বা ডায়ারিয়ার মতো সাধারণ জীবাণুবাহিত রোগের প্রকোপও বাড়ছে। তবে মাত্রার বিচারে স্থানীয়, আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক স্তরেএই জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ভিন্ন হতে পারে। তাই এক্ষেত্রে গবেষকদের সামনে যে চ্যাঞ্জেগুলি রয়েছে সেগুলি হল—

- বাস্তুতন্ত্র ও মানুষের স্বাস্থ্যের ওপর ইকোলজিক্যাল ফুটপ্রিন্ট ও কার্বন ফুটপ্রিন্টের কার্যকারণ সম্পর্ক ও প্রভাবগুলিকে চিহ্নিত করা।
- জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ঝুঁকির মূল্যায়ন এবং তার মোকাবিলায় কী কী ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে তার বৈশিষ্ট্যগুলি নির্ধারণ।
- জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে জনসাধারণের ওপর কী কী বিপদ আসতে পারে তার পাশাপাশি এই পরিবর্তনের সঙ্গে কীভাবে মানিয়ে নেওয়া যেতে পারে এর পর্যালোচনা।
- জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষয়ক্ষতি যথাসম্ভব কমানো এবং তা মোকাবিলার জন্য উপযুক্ত কর্মপরিকল্পনা রচনা, পর্যালোচনা ও তাগ্রহণ।

বাস্তুতন্ত্র ও মানুষের স্বাস্থ্যের ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বায়ু, জল এবং মাটির মাধ্যমে দূষিত পদার্থ কীভাবে ছড়িয়ে পড়ছে এবং বিভিন্ন দূষিত পদার্থের মধ্যে থাকা ক্ষতিকর রাসায়নিকের সংস্পর্শে আসার ফলে বা বিভিন্ন ওষুধপত্রের প্রতিক্রিয়ার ফলে মানবশরীর কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তার পর্যালোচনাও অত্যন্ত জরুরি।

সামগ্রিক প্রভাব পরিমাপ করার কাজ সহজ নয়

জলবায়ু পরিবর্তনের সামগ্রিক এবং অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত বিভিন্ন প্রভাব অঙ্কের হিসাবে পরিমাপ করার কাজটা মোটেও সহজ নয়। এ কাজে অনেক বাধা এবং অনিশ্চয়তা রয়েছে। প্রথমত একটি স্কেল বা মানদণ্ড নির্ধারণ, দ্বিতীয়ত 'ঝুঁকি'র সংজ্ঞা নির্ধারণ এবং সেই সঙ্গে জটিল ও পরোক্ষ কর্মপ্রণালীগুলিকে ব্যাখ্যার কাজটা অত্যন্ত কঠিন। এই সমস্ত জটিলতা ও সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও সাম্প্রতিক অতীত ও বর্তমানের সাক্ষ্য প্রমাণ ও তথ্যের ভিত্তিতে কাজটা শুরু করা যেতে পারে। এই কাজটা শুরু করা গেলে ভবিষ্যতে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব কী পড়তে পারে তা নিরুপণের কাজটা অনেক সহজ হয়ে যাবে। মোদ্দা কথাটা হল এখন যত দ্রুত সম্ভব জল ও জনস্বাস্থ্যের মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে তা তুলে ধরতে হবে এবং সেইসঙ্গে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রাথমিক প্রভাবগুলি প্রমাণ পেশ করার পাশাপাশি কোনও পরিস্থিতিতে জলবায়ু পরিবর্তনের কী প্রভাব পড়তে পারে তার পূর্বাভাস দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। এর পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার বিভিন্ন পরিকল্পনার পর্যালোচনা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষয়ক্ষতি কমানোর বিভিন্ন পরিকল্পনার লাভ-ক্ষতির বিশ্লেষণের কাজ এখন থেকেই শুরু করতে হবে।

জলবায়ু ঘটিত পরিবশে দূষণের সমস্যার মোকাবিলায় নির্দিষ্ট স্থানভিত্তিক, অঞ্চলভিত্তিক এবং বাস্তুতন্ত্রভিত্তিক পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা তৈরির প্রয়োগ সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডগুলি নিয়মিত জারি রাখতে হবে। প্রয়োজনে নিয়মিত এগুলিকে পরিবর্তন ও পরিমার্জন করতেও হবে।

যে প্রশ্নগুলি উত্তর খোঁজা জরুরি

- বিভিন্ন ধরনের গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণে বিভিন্ন ক্ষেত্রের (শক্তি উৎপাদন ক্ষেত্র, পরিবহণ, শিল্প, বাণিজ্য, গৃহস্থালি, কৃষি, বনসৃজন ও বনসংরক্ষণ, মৎস্য চাষ) দায় কতখানি।
- সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রগুলি থেকে গ্রিনহাউস গ্যাসের নিঃসরণ কমানোর জন্য কী কী পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে।
- গ্রিনহাউস গ্যাসের নিঃসরণ বেড়েছে তা স্থির করার মাপকাঠিগুলি কী কী এবং কীভাবে এই ক্ষতিকর গ্যাসগুলির নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে?
- এজন্য কী কী নীতি ও নিয়মবিধি প্রণয়ন করা প্রয়োজন?

এই বিষয়গুলি প্রধানত পরিবেশের প্রধান তিনটি উপাদান যথা জল, বায়ু ও মাটির পারস্পরিক সম্পর্ক আদান ও প্রদানের ওপর নির্ভর করে। যেমন শহরগুলিতে বায়ু দূষণের ফলে যে অ্যাসিড বৃষ্টি হয় তারফলে জলের উৎসগুলি দূষিত হয়ে পড়ে। এই বিষয়টির তাৎপর্য কিন্তু অনেক গভীর। কারণ এর ফলে সামগ্রিক বাস্তুতন্ত্রের খাদ্যশৃঙ্খলই বিপর্যস্ত হয়ে পড়তে পারে।

পরিবেশে দূষণ সৃষ্টিকারী অন্যান্য পদার্থের সঙ্গে জলবায়ু পরিবর্তনের সম্মিলিত প্রভাব যোগ হলে জৈব ভূ-রাসায়নিক চক্রও (বায়ো জিওকেমিক্যাল সাইক্লিং) বিপর্যস্ত হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। যেমন কার্বন, জল, নাইট্রোজেন, সালফার এবং ফসফরাস চক্রে অস্বাভাবিক পরিবর্তন আসতে পারে, কিংবা সংশ্লিষ্ট বাস্তুতন্ত্রের মাটি, বায়ু বা জলে কোনও ক্ষতিকর ধাতু জমা হতে পারে, মানুষের শরীর স্বাস্থ্য ও জীবিকার ওপর যার প্রভাব হতে পারে মারাত্মক।

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত নানা প্রভাবের ফলে খাদ্য উৎপাদন ক্রমাগত মার খাচ্ছে। চাহিদা অনুযায়ী খাদ্য সরবরাহ করা যাচ্ছে না।

আর সেইসঙ্গে, ঘরের বাইরে এবং ভেতরেও দূষণ ছড়িয়ে পড়ার কারণে বাড়ির ভেতরে যাঁরা থাকেন তাঁরাও আজ দূষণজনিত নানা বিপদদের সম্মুখীন।

এই মুহুর্তে পরিবেশ সংক্রান্ত যে বিষয়গুলির ওপর অবিলম্বে নজর দিয়েআশু সমাধানের পথ খোঁজা উচিত তার মধ্যে রয়েছে পরিবেশে জলের চাহিদা জলাভূমিগুলিতে পুষ্টি উপাদানের সংস্থান তথা দূষণ নিবারক/দূষণ হ্রাসকারী হিসাবে এগুলির ভূমিকা কার্বন এবং ইকোলজিক্যাল ফুটপ্রিন্ট এবং বাস্তুতন্ত্রের ওপর ঝুঁকির মূল্যায়ন তথা 'প্ল্যান্ট ফাংশন টাইপ' (পাণ্ডে এবং খান্না, ১৯৯০) এবং বাস্তুতন্ত্রের অর্থনৈতিক দিকগুলির রূপরেখা তৈরি) পাণ্ডে এবং অন্যান্য, ২০০৪) ইত্যাদি।

সম্পাদক সমীপেষু

সফল নিবার্চন কমিশনার হিসাবে ম্যাগসাইসাই পুরস্কার পেয়েছিলেন টিএন শেষণ

এটা আমার ভারতবর্ষ, সেই ভারতবর্ষের নাগরিক হিসাবে আমাদের গর্ব হয়। একজন ভারতীয় হয়ে নাগরিকত্বের প্রমাণ দিতে তারজন্য জন্মের পঞ্জিকা। পাসপোর্ট রেশনকার্ডটাই একমাত্র প্রমাণপত্র হিসাবে ছিল আমাদের কাছে। যার মধ্যে পাসপোর্ট ছাড়া আর কোনও ক্ষেত্রে ছবি দেখতে পাওয়া যেত না। অথচ এই বিশাল ভারতবর্ষে কতজনের পাসপোর্ট রয়েছে যা ছবিতেও তার মুখটাকে দেখা যাবে। এবং অপর একজন চিহ্নিত করতে পারে। এই মানুষেই সেই মানুষ। এমনই একটা চিন্তাধারাকে। মনেতে এনে। প্রত্যেকের জন্য পরিচয়পত্র করে দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছিলেন নির্বাচন কমিশনার টি.এন শেষণ। সেদিন মনে হয়েছিল একটা বিশাল খরচ হয়ে যাচ্ছে। আজ কিন্তু মনে হচ্ছে আমরা প্রত্যেকেই ভারতীয় নাগরিক হিসাবে একটা সচিত্র পরিচয়পত্র পেয়ে গেছি ভোটার কার্ড হিসাবে। যার দরুণনঅনেক বড় একটা সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। দেশের নির্বাচন কমিশনার হলেন সততার অপর নাম। আমরা আজ অতি সহজে একটা কর্মক্ষেত্রে বা ভোট দেবার লাইনে দাঁড়িয়ে খুব তাড়াতাড়ি ভোটটা দিয়ে যেতে পারি। এখানেই মনে হয়। একজন নির্বাচন কমিশনার আমাদের কী উপহার দিয়ে গেছেন। যার দরুন আমরা নিজেদের এই ভারতের নাগরিক বলে প্রমাণ করতে পরি। অনেক বাধা বিপত্তি উপেক্ষা করে ১৯৯৪ সালের অক্টোবর মাসে প্রথমবার পরিচয়পত্র (ভোটার কার্ড) দিল্লিবাসীকে উপহার দিয়েছিলেন। শান্তিপূর্ণ। সুশৃঙ্খলও পরিচ্ছন্ন নির্বাচন পরিচালনার ক্ষেত্রে। বিশেষ সাফল্যের নিদর্শন তিনি রেখেছিলেন। সরকারি কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি যার দরুন ১৯৯৬ সালে ম্যাগসাইসাই পুরস্কার পেয়েছিলেন। আজ বলতেই হবে, নাগরিক হওয়ার প্রমাণপত্র তিনিই দিয়ে গেছেন। সর্বদাই তিনি আমাদের মনের মধ্যে রয়েছেন।

প্রবীর মিত্র, হাওড়া-৪

উন্নয়ন ও সমস্যা

চিঠি পাঠান সংক্ষেপে, বিচারাধীন বিষয় এবং ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধে নয়।............সম্পাদকীয়

লিপি
৩, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র সরণি,
শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

পাঠকের দরবারে

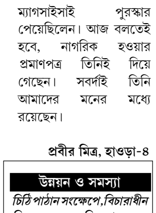

চিঠি পাঠান
লিপি
৩, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র সরণি,
শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়